পূর্ণেন্দু পত্রীর দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকার

(অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার কয়েকদিন আগে একান্ত আলাপচারিতায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলেছিলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। এই নাতিদীর্ঘ খোলামেলা সাক্ষাৎকারটিতে উন্মোচিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত।)

দীপঙ্কর : সাহিত্য-শিল্পের বহুমুখী ধারায় আপনার অবাধ বিচরণ। ছবি আঁকা, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বইয়ের প্রচ্ছদ, এমনকি চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রেই আপনার অনায়াস স্বকীয়তা। এর মধ্যে কোন বিষয়টি আপনার সবচেয়ে প্রিয়?

পূর্ণেন্দু : এভাবে কোনো একটা বিষয় বেছে নেওয়া আমার পক্ষে মুশকিল। আমি যে কাজই করি না কেন, তার সঙ্গে সব'কটা বিষয়ই জড়িয়ে থাকে। একেবারে ছোট বয়সে সেই মাটির পুতুল গড়ার সময় থেকেই। তারপর রঙ তুলি ধরেছি, তারও পরে কবিতা। বছর দু-তিন হল শুধু ছবি আঁকায় মন দিয়েছি। কিন্তু যে কাজই করি না কেন, তার সঙ্গে সবকিছু জড়িয়ে থাকে। ছবি আঁকতে গেলে যেমন কবিতা আসবে, তেমন কবিতাতেও অনিবার্যভাবে এসে যায় ছবি।

দীপঙ্কর : বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে আপনি যুগান্তর এনেছেন। বইকে বিষয়ানুগ দৃষ্টিনন্দন করে তোলার ক্ষেত্রে অক্লান্ত রয়েছেন দীর্ঘদিন। ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনার কি মনে হয় না, প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে? যদি থাকে তবে তা দূর করতে কী করণীয় বলে আপনার মনে হয়?

পূর্ণেন্দু : এ ব্যাপারে বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি। কোথাও কোনো কথা পৌঁছায়নি। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে প্রবন্ধ লিখলেও বাংলা প্রকাশনা জগতের এক চুল নড়বে না। এখন কার জন্য কি মলাট আঁকবো? সেকালের প্রকাশকরা বিষয় বুঝতেন। আর এখন? একটা কিছু হলেই হল। তখনকার প্রকাশকরাই ছিলেন অন্যরকম। ভারবি থেকে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা যখন বের হল আমাকে বলা হল প্রচ্ছদ করতে। এর আগে ইন্দ্র দুগার ওই বইয়ের প্রচ্ছদ করেছিলেন। কিচ্ছু না, শুধু হলুদ জমির ওপর ঝাউপাতা। জীবনানন্দের ভাবনার এক অদ্ভুত প্রকাশ। যেন আচ্ছন্ন করে দেয় আমাদের। দ্বিতীয়বার ওই বইয়ের প্রচ্ছদ যখন আমাকে আঁকতে হল, আমি গেলাম একটা ভীষণ গতিময়তা জগতে। যেন একটা কিছু খোঁজার জন্য ছুটে চলা। এক অনুসন্ধানের জগতে। যার সঙ্গে জীবনানন্দের অনুষঙ্গের একটা মিল খুঁজতে চেয়েছিলাম। এগুলো আমার ভাবতাম। লেখকের বক্তব্য, দর্শনকে ধরার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন?...

দীপঙ্কর : চলচ্চিত্রে আকর্ষণ এল কীভাবে?

পূর্ণেন্দু : এল, না গেল? আচ্ছা, আগে আমার কথাই বলি। আসলে পাঁচের দশকে জোয়ার এল ছবিতে। '৫২-তে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, '৫৫-তে পথের পাঁচালি, ঋত্বিক, সত্যজিৎ, মৃণাল—এতগুলো প্রতিভা, প্রচুর পত্রপত্রিকা সব মিলিয়ে ওই জোয়ারের মাঝে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলাম এই মাধ্যমটায় কাজ করতে হবে। না এলে অনেক কথা না-বলা থেকে যাবে। তাই ছবি করতে এলাম।

কিন্তু কাজ করতে এসে পর পর এমন কতগুলো ঘা খেতে আরম্ভ করলাম যে মন ভাঙতে শুরু করল। সাধারণ অশিক্ষিত প্রোডিউসাররা ওরকম আচরণ করলে কিছু মনে করতাম না। কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিমান প্রগতিশীলদের কাছ থেকে যখন ঘা খেতে শুরু করলাম, তখন ভাবলাম, এমন স্বার্থপর জায়গায় কাজ করতে পারব না। তাই বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিলাম সিনেমা। আর এখন তো কেউ ছবি দেখে না। কলকাতার কোনো সিনেমা হলে এখন পরিবারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে পারবে? দ্বিতীয়ত, টিভি। টিভি আসার পর ফিল্মের ব্যাকরণটাই লোপ পেয়ে গেছে। ছবির আগে, পরে এবং পেটে পর্যন্ত বিজ্ঞাপনের ছেদ। ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে দর্শকদের ভাবনা। হয়তো দেখছে দেশের দারিদ্র সমস্যার ওপর কোনো ছবি, তার পেটে ঠিক বিপরীতধর্মী বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে একেবারে স্যান্ডুইচ হয়ে গেছে টিভির ছবি। ভাল ছবি দেখে হল থেকে বেরিয়ে যে আলোচনা হত, একমাস, দু'মাস যে ছবির ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খেত সে আলোচনা, ভাবনার সুযোগ কই এখন।

দীপঙ্কর : ৩০০ বছরেরও বেশি পুরনো শহর কলকাতায় প্রাচীন বাড়ি ও সৌধ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আপনার অভিমত কী? সিনেট হল ভাঙার সময় আপনি যে ছবি তুলে রেখেছিলেন, তা তো আজ ঐতিহাসিক দলিল। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

পূর্ণেন্দু : আমাদের এখানে সবই অবহেলিত। সৌধ বলো, সৌধ। মূর্তি বলো, মূর্তি। সব। রবীন্দ্রভারতীর কথা বলো, সেখানেও দেখবে রবীন্দ্রনাথ অবহেলিত। ভাবা যায়, একটা ভাল মিউজিয়াম পর্যন্ত নেই।

দীপঙ্কর : সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ণ কি?

পূর্ণেন্দু : আমার মনে হয়, আমরা ওঁকে যেন মেনে নিচ্ছি। ঠিকমত মূল্যায়ণ করছি না। জীবিতকালে তাঁর স্তবগান হয়েছে। আগামী ২০-২৫ বছরে যা লেখা হবে, সেখান থেকেই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ণ হবে। তা বলে, তিনি কিছু কনট্রিবিউট করেননি তা ভেব না। এতকাল, তাঁর কনট্রিবিউশনকে আমরা ১০০-এর মধ্যে ১০০-ই দিয়েছি। এখন মূল্যায়ণ হলে কেউ নম্বর দেব ৭০, কেউ ৭৫, কেউ ৮০। কারণ ওঁর সৃষ্টি নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসা আছে। যা এখনও তেমন করে ওঠেনি। উঠবে। উঠলেও এমন নয় যে, তিনি খারিজ হয়ে যাবেন। আসল ব্যাপার মানুষটাকে সম্পূর্ণ করে দেখা। এবার তা শুরু হবে।

দীপঙ্কর : চিত্রশিল্পী হিসেবে এবঙ্গের ছবির জগৎ আপনার কেমন মনে হয়?

পূর্ণেন্দু : গ্যালারি-কালচার শুরু হয়ে ছবির জগতে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তা ছবির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। আর্টিস্ট তৈরির পেছনে আজকের গ্যালারির কোনো অবদান নেই। আছে কেবল তৈরি হয়ে যাওয়া আর্টিস্টকে নিয়ে টানাটানি। গত ৫ বছরে কলকাতার অন্তত গোটা তিনেক প্রধান গ্যালারির কর্মকর্তারা আমাকে বলেছেন, এই যাচ্ছি, আপনার বাড়ি। ছবি দেখতে। কিন্তু আসেননি। আসলে, যদি তাঁরা জানতেন আমার ছবি খুব বিক্রি হয়, তাহলে ৫ বছরের ৫০ বার আসতেন আমার কাছে।

দীপঙ্কর : আপনার 'কথোপকথন' কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের কাছে রেড বুকের মতো। প্রেম করি বা না করি আমরা সবাই ছিলাম 'কথোপথনে'র উৎসাহী পাঠক। শুভঙ্কর ও নন্দিনী সময় থেকে উঠে আসা তরুণ-তরুণী। কেউ কেউ বলেন, আবৃত্তিকার গৌরী ঘোষের আদল আছে নন্দিনীর মধ্যে। আপনি কি বলেন?

পূর্ণেন্দু : না, না। তেমন সরাসরি কিছু নয়। গৌরী ও পার্থকে খুব ভালবাসতাম। অনেক চরিত্র তৈরির পেছনে এক-একজন কাজ করে। আসলে স্বপ্নেরও তো একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু সরাসরি কেউ নন্দিনীর মধ্যে নেই। হয়তো বাস্তবের অনেকেই আছে, আবার অন্য কেউও হয়ত আছে।

দীপঙ্কর : এই মুহূর্তে বাংলা কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

পূর্ণেন্দু : কবিতা নিয়ে কিছু বলব না। প্রচুর কবি, প্রচুর কবিতা। হোড়ের হাট হয়ে গেছে এখন কবিতা। কত বিখ্যাত কাগজ বেরোচ্ছে। কোনো-কোনোটার সম্পাদক নিজেই লিখতে জানে না। অথচ কাগজ বেরোচ্ছে। এই কবিদের বা কবিতার সমৃদ্ধ হওয়ার মত খোরাক সম্পাদকও খোঁজেন না, কবিরাও না। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা।

দীপঙ্কর : সভাসমিতিতে এখন আপনাকে এত কম দেখা যায় কেন?

পূর্ণেন্দু : বেশ কিছুদিন ধরেই সভাসমিতিতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। অভিমানে, ক্ষোভে। আসলে আমরা যে কিছু করেছি, সে কথা যেন মনেই হয় না। প্রচ্ছদের কথাই ধর, এতদিন বইয়ের জন্য ভেবেছি, কাজ করেছি, একথা যেন কেউ মনেই করে না। এখন মনে হয়, ৩০০০ মলাট না এঁকে ৩০০ রান করলে অনেক বেশি সম্মান পেতাম। আসলে ইতিহাস বোধটাই আমরা নষ্ট করে ফেলেছি।

দে'জ পাবলিশিং-এর প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।